Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 537 – 543
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বর্তমান সমাজে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও রবীন্দ্রসংগীত

পল্লবী সরকার
গবেষক, রবীন্দ্রসংগীত নৃত্য ও নাটক বিভাগ
সংগীতভবন, বিশ্বভারতী
Email ID : pallabisarkar.vb.music@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Nature, Education, Rabindranath Tagore, Rabindra sangeet, Development, socio-economic degradation, pollution.

Abstract
It is evident that the human civilization has attained its zenith within the first half of the twenty first century through the rapid modernization and development of Science and technology. But this process of development has been always faced questions in a repeated manner due to this gradual socio-economic degradation. If we want to inspect the real reason behind this, we have to light our thought towards the present scenario of the education system, the base of human civilization.

Present day's education system is deviating gradually from the actual definition obtained from EDUCATION. Externally our civilization has been become enriched through our educational planning, tradition, science & technology but the internal emptiness is destabilizing the whole system. As a result we are facing social intolerance and natural disaster regularly. Now the time has come to adapt such system of education which is capable to create fraternity, knowledge base, tolerance within the human society of this globe. This type of education system is quite similar with the education system propounded by Rabindranath Tagore.

Tagore wanted to free the child mind from the synthetic civilization and tried to develop a positive vibration and connection between human mind and Mother Nature. This thought of Tagore was converted into reality through the establishment of Bramhacharjasram at Santiniketan. According to Gurudev regarding the tradition observed in Bramgacharjasram, that here students achieve an asset which are not related to class room i.e. related with joy of living and connected with nature. Human soul establishes its connection with the purity of nature. This asset cannot help in the examination but it helps in the fulfillment of the life. Songs were the main part of this system and Tagore tried to build the philosophy of life of the students through songs. These season based songs were become the pivotal medium of the nature centric education. This is why Tagore started

nature centric festivals at Santiniketan. This festivals have vital roles to establish connection between the student's mind and nature. But the class room education is not capable to do this properly.

Now a days the Tagore thought of education is evident in most of the part of our life. As a country develops itself not only through the participation in the rat race of the globalization but also through the value system, environmental awareness , moral development and these are the important factors for the proper development. We must place the environmental awareness in the garland of life and education system for the holistic and overall development. This phenomena of education was reflected in the system of Vedic TOPOBAN and also in the arena of Santiniketan, the abode of peace.

Discussion

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সূচনাতেই বিশ্বে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতা উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার এই উন্নয়নের যাত্রাপথে বর্তমান বিশ্বের প্রাকৃতিক তথা সামাজিক অবক্ষয় মানবসভ্যতাকে তার অর্জিত গৌরবের স্থিতিশীলতা এবং যথার্থতা নিয়ে একধিক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সর্বাগ্রে যে দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজন তা হল বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা, যা আমাদের মানবসভ্যতার মূল এবং ভিত্তিস্বরূপ। আমার আলোচ্য বিষয়টি হল বর্তমান সমাজে প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও রবীন্দ্রসংগীত।

আধুনিকতার নিরিখে আমাদের দেশ বা সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানচিন্তা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ক্রমশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দময় ও আরামদায়ক করে তুলছে। কম আয়াসে বৃহৎ কিছুকে প্রত্যহই আমরা লাভ করছি। কিন্তু এহেন আধুনিকতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের প্রাকৃতিক তথা সামাজিক অবনমন তথাকথিত উন্নয়ন শব্দটির প্রয়োগ নিয়ে শিক্ষিত সমাজের কাছে এক বৃহৎ প্রশ্নচিহ্নের অবতারণা করেছে।

সম্প্রতি পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলি একটি শব্দের সাথে বহুলাংশে পরিচিত হয়েছে,যা হল স্থিতিশীল উন্নয়ন, যেখানে জাতিসংঘ উন্নয়নকে স্থিতিশীল করতে কতগুলি লক্ষ্যকে নির্বাচন করেছে এবং সেগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

এখানে প্রথমে একবিংশ শতকের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উভয়প্রকার সংকটের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এই দুটি বিষয়ই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। ২০০০-২০২০ এই ২০ বছরের সময়সীমাটিকে ধরে এই সময়কালীন সামাজিক ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে দেখা যাবে তা ক্রমবর্দ্ধমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২০০০-২০১০ এই ১০ বছরে প্রায় ৮.৭ হেক্টর জমির অরণ্যনিধণ হয়েছে। যার ফলস্বরূপ বায়ুদূষণ, জলদূষণ প্রভৃতি পরিবেশগত সমস্যাগুলিও সমান্তরাল ভাবে ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। (তথ্যসূত্র- **India Deforestation Rates & Statistics/GFW- Global Forest Watch**)

বিশ্বব্যাপী এই পরিবেশগত অবনমন রোধ করতে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯১ সাল থেকে দেশের সমস্ত বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশবিদ্যাকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করার নির্দেশ দেয় এবং ২০০৩ সালে এই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করে সুপ্রিমকোর্ট।

সামাজিক অবনমনের চিত্রটিও প্রায় অনুরূপ। ২০০০-২০১৫ এই ১০ বছরে সমাজবিরোধী অপরাধমূলক কার্যকলাপের পরিমান ৩৪% থেকে ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে (তথ্যসূত্র - **NCRB- National Crime Record Bureau**)। তাই শুধুমাত্র কোনো বিধিপ্রণয়ন বা সচেতনতামূলক কর্মসূচী দ্বারা পৃথিবীর এই সংকট রোধ করা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের পরিবেশ সচেতনতা থেকে শুরু করে সমাজ সচেতনতা এসবের মূলে আছে আমাদের মূল্যবোধের শিক্ষা, অসহনশীলতা ও স্বার্থপরতা। প্রত্যহ এই মূল্যবোধের অভাব সর্বোপরি আমাদের অপরিসীম চাহিদার জন্য আমরা পরিবেশগত নানাবিধ বিপর্যয় ও সামাজিক অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছি। মানুষ একা সঠিকভাবে বেঁচে থাকতে পারেনা।

তাই যে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব, তাকে উন্নয়নের পথে চলতে গেলে প্রকৃতি এবং মানুষের উন্নয়নের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক উন্নতি কখনোই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে কল্যাণ আনতে পারেনা। শিক্ষা যদি প্রকৃত না হয়,কল্যাণকারী না হয় তবে সে শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উন্নয়নভাবনা যদি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে কল্যাণকর না হয় তবে তা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। সমাজের এই সীমাহীন অসহশীলতা ও স্বার্থকেন্দ্রিকতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যেদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন তা হল বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা, যা উন্নয়নের ইঁদুরদৌড়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাবিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা শব্দটির যে ব্যখ্যা দেয় একালের আধুনিক শিক্ষারীতি সেই শিক্ষা থেকে ক্রমশ সরে আসছে।এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী করে এবং তার বৃত্তি অর্জনে সহায়তা করে মাত্র, কিন্তু এর দ্বারা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন কখনই সম্ভব নয়। একটি রাষ্ট্র বা সমাজের শিক্ষার গুনগত মান সেই রাষ্ট্র বা সমাজের উন্নয়নের ভিত্তি স্বরূপ। সুতরাং পৃথিবীর এই সামগ্রিক অবক্ষয়কে তার মূল থেকে নিরোসন করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এমন এক শিক্ষাপরিকল্পনা গড়ে তোলা যা শিক্ষার্থীর মানবিক গুনাবলীর বিকাশের মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তুলবে এক সহজ মমত্ববোধ। যে শিক্ষাচিন্তার সাথে সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত প্রকৃতিকেন্দ্রিক পরিপূর্ণ বিকাশের শিক্ষা।

রবীন্দ্রজীবনে কাব্যসাধনা তাঁকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দিলেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তো শুধু কাব্য বা সাহিত্যের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন কর্মী, একজন শিক্ষাবিদ। ভারতের একমাত্র শিক্ষাবিদ যিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা, সমাজচিন্তা এবং বিশ্বচিন্তা একই সূত্রে গাঁথা।

রবীন্দ্রসৃষ্টির এক বিরাট ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে মানুষ এবং প্রকৃতি। প্রকৃতির সাথে তাঁর টান জন্মান্তরীণও বলা চলে। বাল্যকালে পরিবারের বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন আড়াল আবডাল থেকে। গরাদের ওপার থেকেই নিসর্গের রূপ-রস-গন্ধ কবিকে ছুঁয়ে যেত। পরবর্তীতে দীর্ঘকাল শিলাইদহের বিস্তৃত নদীর চরে বসবাস প্রকৃতির সাথে তাঁর সখ্যতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

শৈশবে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা কবিকে ভীষণ মানসিক পীড়া দিয়েছিল। তাই চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে শিশুদের শিক্ষাদানের বিষয়টি তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রকৃতির সান্বিধ্যে খোলা আকাশের নীচে শিশুদের মুক্তি দিতে। তারপর ক্রমশ অনুভব করেছিলেন শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, মানুষে মানুষে যে বিস্তর ব্যাবধান আছে তা অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাটলোকে মুক্তি দিতে হবে। এই আদর্শ নিয়েই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা।[১]

বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা একটা বড় জিনিস লাভ করেছে। সেটা ক্লাসের পাঠ্যবিষয় নয়। সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করেনা কিন্তু জীবনকে সার্থক করে। চারিদিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে আনন্দের ছোটো-বড়ো নানান যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড়ো লাভ তা বলে শেষ করা যায় না।

যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমে শিক্ষার কোনোদিককেই বাদ রাখেননি। বাল্যকালে তিনি যেমন পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য দের কাছ থেকে প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমেই জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই তিনি প্রকৃতিপাঠের মধ্যে দিয়ে এবং মানুষে মানুষে মিলনের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী পাঠক্রম রচনা করেছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রাচীরের বন্ধন মোচন করে আনন্দের ক্ষেত্রে তিনি শিশুদের মুক্তি দিয়েছিলেন।[২]

'বিশ্বভারতী' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ

করার মধ্যে দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে।আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মত কোলে করে মানুষ করছে।"[৩]

তাই তিনি শিক্ষার্থীদের গাছের তলায় মুক্ত পরিবেশে পাঠদানের অভিনব রীতি প্রচলন করেছিলেন। যে সুবিশাল লীলাময় প্রকৃতির কোলে মানুষের জন্ম সে যে শুধুমাত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নয়। আমরা যে আলো, বাতাস, গাছপালা, প্রাণীজগতের মধ্যে বেঁচে আছি, সেই জীব-জড় পরিবেশের সমন্বয় এবং তাদের অস্তিত্ব যে কীভাবে আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাঁর সবটাই যে সৃষ্টির বিকাশ ও সমৃদ্ধির অঙ্গ সেটা শিশুকাল থেকেই মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলাটা জীবনের খুব বড় শিক্ষা। মানুষ, প্রকৃতি, উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র্য সবকিছুই যে পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ— এই বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় জড় ও চেতনের মধ্যে যোগাযোগের রূদ্ধদ্বারটি খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার বড় অংশই ছিল চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা এবং এই প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের গান তথা ঋতুউৎসব গুলি।[৪]

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের শিক্ষায় সূর্যোদয়ের সাথে শয্যাত্যাগ থেকে দৈনিক উপাসনা, গাছপালার পশুপাখি নিরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ, সাহিত্যবোধ তৈরির জন্য সাপ্তাহিক সাহিত্যসভা, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সন্ধ্যায় রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, গান-ছবি আঁকা প্রভৃতি কোনকিছুই বাদ ছিলনা। শুধুমাত্র জ্ঞানঅর্জন নয়, দরিদ্রসেবা, গ্রামের শিক্ষা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ, রাস্তা মেরামত, বাগান তৈরি, চাষী-কুমোর, কামার তাঁতিদের কর্মজীবন অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন সমাজের প্রতি কর্তব্য-পরায়ণতা বোধ জাগ্রত হয়ে উঠতো, তেমনই বৃত্তিশিক্ষার ধারণাও তাদের মধ্যে গঠিত হত।

তাঁর শিক্ষাভাবনার অন্যতম মুখ্য আরেকটি দিক হল আশ্রমের ঋতুউৎসবগুলি। প্রকৃতি যে মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ঋতু-উৎসবগুলি উদযাপনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের মানুষের মধ্যে সেই বোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ঋতু-উৎসবগুলিতে প্রকৃতিকে মানবরূপে প্রতিষ্ঠা করে মন্ত্রে, গানে, নান্দনিক উপাচারে কবি তার বন্দনা করেছেন। বর্ষামঙ্গল, বসন্তউৎসব, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ এগুলি শুধু একেকটি উৎসবমাত্র নয়। বর্ষা, বসন্ত, শরৎ - এই ঋতুগুলি উপলক্ষে রচিত গান, নাটক, কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতি মানুষের মনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রচিত শারদোৎসব, ফাল্গুনী, বসন্ত, সুন্দর, শেষবর্ষণ, নটরাজ- ঋতুরঙ্গশালায় নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল এক গভীর প্রকৃতিচেতনা। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঋতুবিভাজন অনুসারে গানের বাণীর মধ্যে দিয়ে ঋতু গুলিকে কবি যেমন মানুষের সঙ্গী রূপে চিত্রিত করেছেন তেমন কোথাও ঈশ্বর রূপে বন্দনাও করেছেন।

কবির গ্রীষ্মের গানে বৈশাখের কঠোর তপস্বী রূপের আহ্বান জানিয়ে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যেমন গেয়েছে, 'এসো, এস, এসো হে বৈশাখ', আবার গ্রীষ্মের কঠিন দাবদাহের পর বর্ষার শ্যামল করুণাঘন রূপে তারা গেয়ে উঠেছে 'এসো শ্যামল সুন্দর'। কখনো শরতের নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘেদের দেখে তারা আনন্দে গেয়েছে 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা' আবার শারদলক্ষ্মীর বিদায় বেলায় অবসন্ন হেমন্তে গেয়ে উঠেছে 'হিমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।'

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'নবীন', 'বসন্ত' নাটকে কবি যেভাবে ছদ্মবেশী শীতের আবরণ সরিয়ে বসন্তকে আহ্বান করেছেন, তেমনই তার সুরেই সুর মিলিয়ে আশ্রমের শিশুরা গেয়ে উঠেছে 'নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদের দ্বারে'। বসন্তের উৎসবে মেতে ওঠার আহ্বান জানিয়ে তারা গেয়েছে 'ওরে গৃহবাসী খোল, দ্বার খোল,লাগল যে দোল'।

প্রকৃতির এই ঋতুগুলি যে একে অপরের পরিপূরক রূপে আবর্তিত হয়েছে অনন্তকাল জুড়ে তার অন্তর্নিহিতে শূন্য থেকে পূর্ণ হয়ে ওঠার যে দর্শন তা সূচনা থেকেই শিক্ষার্থীর অন্তরের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির গানগুলি যে শুধুমাত্র তাদের আনন্দ দান করেছিল তাই নয়, ঋতুসংগীত গুলির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সেই নির্দিষ্ট ঋতুর কি কি

বৈশিষ্ট্য,সেই সময়ের উপযোগী কি কি ফুল,ফল,উদ্ভিদ আছে, তাদের প্রকৃতি কিরূপ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তারা জ্ঞান লাভ করতে পারতো। আশ্রমের উৎসবগুলিও অনুরূপ ভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃতিশিক্ষার পাঠ দান করেছিল। ঋতু উৎসবগুলি পালনের রীতিগুলি এমন করে নির্ধারিত করা হয় যাতে প্রকৃতিকে শিক্ষার্থীরা আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় বৃক্ষরোপণ উৎসবে শিক্ষার্থীরা শিশু তরুদের নতুন অতিথি রূপে আহ্বান জানিয়ে ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ প্রভৃতি মাঙ্গলিকদ্রব্য দ্বারা বরণ করে পঞ্চভূতের কাছে আশীর্বাদবাণী প্রার্থনা করে তাদের রোপন করে। এখানে পঞ্চভূতের ভূমিকাতেও আশ্রমের শিশুরাই অভিনয় করে থাকে। শিশুবৃক্ষদেরকে উষ্ণ আহ্বান জানিয়ে তারা গেয়ে ওঠে 'আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে' অথবা মরুবিজয়ের কেতন উড়াও'। আবার একই ভাবে হলকর্ষণ উৎসবেও ধরিত্রী মায়ের মাটির প্রতি ভালোবাসায় আশ্রমের কণ্ঠে ধ্বনিত 'ফিরে চল মাটির টানে, যে মাটি চেয়ে আছে আঁচল পেতে'। এই উৎসবগুলিতে প্রকৃতির সাথে সাযুজ্য রক্ষা করে আলপনা, ফুলের গয়না, ফুল-লতা-পাতার ব্যাবহার প্রভৃতি উপাচারের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মধ্যে প্রকৃতিমুখী নান্দনিক অনুভূতি, সৌন্দর্যদর্শন এবং সৃজনশীলতা গড়ে উঠতো।[৫]

এই ভাবেই প্রকৃতিপাঠের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সাহিত্য সর্বপ্রকার জ্ঞান অর্জন করতো। আশ্রমে কত গাছপালা আছে, তাদের কার কত সংখ্যা, তাদের কখন ফুল ধরে, পাতা ঝরে, পাতা ওঠে, তাদের ডালপালা, শিকড় প্রভৃতির আকৃতি, স্বভাব এবং পারিপার্শ্বিক সবকিছু পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের সাথে তাদের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি হত।

কবি অনুভব করেছিলেন, যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে মানুষের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত হলে তার শিক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারেনা। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ মানুষের চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দেয়। তাই আশ্রমের শিক্ষায় প্রকৃতির সাথে যোগে উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, নৃত্য-গীতে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দ আস্বাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিত্ত পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর শিক্ষার সংকল্প।[৬]

মানুষের জীবনের বর্তমানের কর্ম বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ভবিষ্যতের কর্ম এবং ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভিত যদি শক্ত না হয় তবে কোনো স্থাপত্য বা কীর্তি অটলভাবে নিজের অস্তিত্বকে বহন করে চলতে পারেনা। পরিবেশগত অসচেতনতা হোক বা সামাজিক অবক্ষয়, এই সব কিছুর নেপথ্যেই থাকে কনো ব্যক্তির জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা। কনো শিশু বা শিক্ষার্থী যে পরিস্থিতি বা যে পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠবে তার ভবিষ্যতের কাজের মধ্যেও সেই শিক্ষাই প্রতিফলিত হবে।

সাম্প্রতিক কালে দেশ বিদেশের শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং এর মান উন্নয়নের প্রতি চিন্তাশীল হয়েছেন। আমদের দেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষারীতির বিভিন্ন কৌশলকে মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করা হচ্ছে। পাঠক্রমে সৃজনশীলতা, সমাজশিক্ষা, পরিবেশবিদ্যা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ তৈরির জন্য smart classroom, Audio-visual Teaching Aids প্রভৃতি ব্যাবহার করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং যন্ত্রশক্তির প্রয়োগে শিক্ষার হার এবং বৃত্তিগত সাফল্যের হার বৃদ্ধি পেলেও তার প্রকৃত মানোন্নয়ন সাধিত হচ্ছেনা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যান্ত্রিকতা এবং প্রতিযোগিতার মাঝে প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রকম সামাজিক অসহিষ্ণুতা। স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে মানুষ নির্দ্বিধায় প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বিবেক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়নের ঘোড়দৌড়ে সামিল হচ্ছে। যার শিকার হচ্ছে এই পৃথিবী'ই।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষার পুঁথিসর্বস্বতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশে প্রচলিত ঔপনিবেশিক বা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে এই সর্বাঙ্গীণ লক্ষ্যের যোগ নেই।... কেবলমাত্র কেরানিগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি মুন্সেফি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ।"[৭] কবির বক্তব্য ছিল যতদিন বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের ওপর মানুষের অন্নলাভ নির্ভর করবে ততদিন শিক্ষার সংস্কার করা সম্ভব নয়।

বর্তমানেও সেই রূপেই শিশুদের বইয়ের বোঝা দিনে দিনে বাড়ছে কিন্তু প্রকৃতি, গাছপালা, পরিবেশ এমনকি মানুষের প্রতিও কোনো রকম আত্মিক যোগ তৈরী হচ্ছে না, কোনো ভালোবাসা তৈরি হচ্ছেনা। দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাবিদরা, উচ্চশিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা, গবেষকরা পরিবেশবিদ্যা, মূল্যবোধের শিক্ষা, বিশ্বশান্তি – এই সব বিষয়ে একাধিক সেমিনার, আলোচনা সভা, বিতর্কসভা সংগঠিত করছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মূল থেকে এই প্রকৃত শিক্ষার বীজটিকে শিক্ষার্থীর মধ্যে বপন করে দেওয়া না যাবে ততদিন পর্যন্ত এই ক্রমবর্দ্ধমান সংকটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি যদি শিশুর কোনো ভালোবাসা না থাকে, প্রকৃতির সাথে যদি কোনো সংযোগ না থাকে তবে শুধুমাত্র পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সচেতনতাবোধ তার মধ্যে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়।

তাই শুধুমাত্র যান্ত্রিক উপায়ে অথবা পুঁথিগত ভাবে নয় প্রকৃতির সাথে যোগের মধ্যে দিয়েই শিশুর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং দায়িত্বের বোধকে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সহজাত ভাবেই শিশুর মধ্যে পরিবেশকে রক্ষা করার বোধ জন্মায়।

প্রকৃতির নিবিড় সান্বিধ্য, উৎসব, সংগীত যা পারে প্রযুক্তি কখনোই তা পারে না। একটি শিশু প্রকৃতির মধ্যে উপস্থিত থেকে হাতে-কলমে ব্যাবহারিক ভাবে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির উপাদান গুলির সম্পর্কে যতটা সম্যকজ্ঞান অর্জন করতে পারে, গানের সুরের বন্ধনে প্রকৃতি যেভাবে শিশুর অন্তরের সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা ঋতুউৎসবগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি শিশুমনে যে আনন্দের স্পর্শ রাখতে পারে একটি Audio-visual Presentation বা ৪৫ মিনিট অথবা ১ ঘণ্টার পরিবেশবিদ্যার ক্লাস কখনোই সেভাবে শিশুর মনে, শিক্ষার্থীর মনে জায়গা করে নিতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরিবেশ বা সমাজ সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ভাবে শুধুই সচেতনতা গড়ে তোলার শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে মানুষ তাঁর যত্ন করবে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে সমগ্র পৃথিবীকে একটি পরিবার জ্ঞানে তার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে। শুধু সচেতনতা নয়, প্রয়োজন একাত্মতা, আত্মীয়তা এবং মমত্ববোধ গঠন।

কিন্তু জীবনের এইসব প্রতিকূলতা আমাদের ভীত এবং বিপর্যস্ত করলেও আমরা পিছিয়ে পড়ে থাকতে পারিনা, আমাদের ষড়রিপুর স্বেচ্ছাচারিতার কাছে হেরে যেতে পারিনা, কারণ এই বেদনার মধ্যে দিয়েই আমরা একদিন চেতনাতে পৌঁছতে পারব। রবীন্দ্রনাথের মত এইরকম দূরদর্শী শিক্ষাবিদ, তথা সমাজবিদদের ভাবনার পথ ধরেই এই মূল্যবোধহীনতা, স্বার্থকেন্দ্রিকতা থেকে আমাদের চৈতন্যলাভ ঘটবে। বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা সেদিন গুরুদেবের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারব, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' সর্বোপরি এত সাম্প্রদায়িকতা-হানাহানি, এত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, এত অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও শুভভাবনাগুলো আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই আজ'ও দেখতে পাই মানুষ সব ভেদাভেদ ভুলে উৎসবে মেতে ওঠে, প্রকৃতির সৃজনের কাজে ব্রতী হয়, নিজের প্রাণের বাজি রেখে অপরের প্রাণরক্ষা করে, সহায়হীন মানুষ ও অনাথ শিশুদের আশ্রয়দাতার ভূমিকা নেয়। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল একটা সুস্থ সমাজ ও একটা স্নিগ্ধ সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলা। উন্নয়ন তখনই হয় যখন তা আমাদের জীবনে চিরস্থায়ী কল্যাণ নিয়ে আসে। এই কল্যাণের বোধ মানুষের মধ্যে তার জন্মলগ্ন থেকেই অবশ্যভাবে গড়ে তোলা উচিৎ, তবেই এই পৃথিবীর সংকট ঘুচবে। কবি চেয়েছিলেন পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে প্রযুক্তি ও মানবসভ্যতা একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে চলুক, কিন্তু তা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে উত্তীর্ণ করে নয়। প্রকৃতির সাথে মানুষের দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়ার যে আবর্তন চক্র,তার নিয়মকেই জীবনে পালন করে চলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসারের মধ্যে দিয়েই পুনরায় আমাদের জীবনে বিবেক, মূল্যবোধ, কল্যাণ, শান্তি এই শব্দগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে, প্রকৃতি আমাদের বন্ধু হয়ে উঠবে, এই আশা, এই বিশ্বাসকে পাথেয় করেই আগামীর পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে।

Reference :

১. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৮১-৪৮৪
২. গঙ্গোপাধ্যায়, তপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, পৃ. ২৭
৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫১৭-১৮
৪. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, বিশ্বভরা প্রাণ : পরিবেশভাবুক ও রূপকার রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২৬
৫. সামন্ত, সুশীল কুমার, বিশ্বভারতীর উৎসব, পৃ. ৫৩
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, তপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, পৃ. ৫৪
৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৯৫

Bibliography :

আকরগ্রন্থ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড। মাঘ ১৩৯৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা ৭০০০০১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, মাঘ ১৩৯৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা ৭০০০০১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড। মাঘ ১৩৯৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা ৭০০০০১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৩৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭

সহায়ক গ্রন্থ :

দুলাল চৌধুরী, শান্তিনিকেতনের উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৬, সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, কলিকাতা ৭০০৩৪।

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনে পরিবেশচর্চা, ২০০৩, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩।

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বিশ্বভরা প্রাণ : পরিবেশভাবুক ও রূপকার রবীন্দ্রনাথ, এবং মুশায়েরা, পৌষ ১৪১৫, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩।

সুশীল কুমার সামন্ত, বিশ্বভারতীর উৎসব, সুবর্ণরেখা, ৬ মাঘ ১৩৮৯, পরিবেশক: সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন।

তপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, সাহিত্য প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, কলিকাতা-৩৪।

Online reference :

India Deforestation Rates & Statistics/GFW- Global Forest Watch
link- https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IND/
NCRB- National Crime Record Bureau (https://ncrb.gov.in/